6

তারিখ 29 MAY 1996
পৃষ্ঠা ২৫

দৈনিক ইত্তেফাক

পথে প্রান্তরে

পথচারী

স্কুল পাঠ্যবই-এর সঙ্কট এই মে মাসেও দূর হয়নি। আরও দু'এক মাসের মধ্যে যে দূর হবে এমন আশাও করা যায় না। জানুয়ারীতে যখন পাঠ্য-বই এর সঙ্কটের সংবাদ পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় তখন মনে হয়েছিল, যেহেতু এই সঙ্কট প্রতি বছর হয়ে আসছে তাই টেক্সট বুক বোর্ড যত দ্রুত সম্ভব এর সমাধান করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয়ে বছরের প্রায় মাঝামাঝি এসেছে তখনও সঙ্কট যা ছিল তা-ই থেকে গেছে। শুধু তা-ই নয়, সঙ্কট তীব্রতর ও বিস্তৃত হয়েছে। এবারের পাঠ্যবই-এর সঙ্কটের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়ার অবশ্য আরও একটি কারণ রয়েছে। তা হল, নবম শ্রেণীর নতুন বই-এর সংকট। এসএসসি পরীক্ষার কোর্স শুরু হয় নবম শ্রেণী থেকে। ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি'র প্রস্তুতি নেয়াও শুরু করে নবম শ্রেণীতে পা দিয়েই। অন্য শ্রেণীর বই দু'চারদিন পর পেলেও হয়তো পরে পুষিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু এসএসসি'র বই পেতে বিলম্ব হলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চাপ পড়ে। সে জন্যই এবার পাঠ্য-বই পেতে বেশী বিলম্ব হওয়ায় সারা-দেশে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড অবশ্য প্রথমে নীরবতার ভান করেছিল, তবে দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ায় সম্প্রতি তারা মুখ খুলেছে। বলেছেন, এজন্য তাদের দায়িত্ব থাকলেও এর জন্য মূল দায়ী বই প্রকাশনা সমিতি। সমিতি বই ছেপে দিতে পারবে বলে বই ছাপার দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু তারা শর্তমত বই ছেপে দেয়নি। ফলে বই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সে সঙ্গে তারা বই প্রকাশনা সমিতির চুক্তি খেলাপ ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বই প্রকাশনা উন্মুক্ত করে দেয়ার ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ এখন যে কোন প্রকাশক-মুদ্রাকর বই-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে দ্রুত ছেপে তা বাজারজাত করার অধিকার পাবে। এটা সম্ভব হলে হয়তো মাসখানেকের মধ্যে বই বাজারে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ততদিনে বছরের অর্ধেক পার হয়ে যাবে। এই অর্ধবছরে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-শুনার যে ক্ষতি হল তার ক্ষতিপূরণ কি করে হবে এ প্রশ্নটিই তখন অত্যন্ত বড় হয়ে দেখা দেবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে পাঠ্যবই-এর সংকট এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় অত্যন্ত ব্যাপক তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মৌলভীবাজার, চাঁপাই-নবাবগঞ্জ, রামগড়, ফেনী, কক্সবাজার, টেকেরহাট, কালিয়াকৈর, সুন্দরবান, রাজশাহী, পাবনাসহ বহু অঞ্চলের বই সংকটের যে সংবাদ গত কয়েক দিনের পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাতে দেখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের এক-চতুর্থাংশ কিংবা তারও বেশী বই সরবরাহ করা হয়নি। সিলেবাস পরিবর্তন করে যে নতুন বই নির্বাচন করা হয়েছে সে ক্ষেত্রেই এই সংকট তীব্রতম। অন্য বই-এর সংকট ছাত্র-ছাত্রীরা কোনটা পুরানো বই দিয়ে আবার কোনটা দ্বিগুণ দামে কিনে পূরণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু নতুন বই যোগাড় করার কোন উপায়ই নেই। এখন এ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা হল, পূর্বে একটি নিয়ম ছিল, নতুন বই ছাড়তে হলে এক বছর আগে প্রক্রিয়া শুরু করতে হত। যাতে ঠিক সময়ে বইটি ছেপে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া যায়। এবার নাকি সে নিয়ম মানা হয়নি। প্রকাশকরা বলেছেন, ছেপে যথাসময়ে বের করে দিতে পারবে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ তা বিশ্বাস করেছেন। অন্যদিকে এই প্রকাশক সমিতি নির্বাচনের ছাপাছাপির কাজ নেয়ায় যাওবা করতে পারতো তা পারেনি। বেশি লাভের আশায় তারা বোর্ডের বই ফেলে রেখে নির্বাচনী ছাপার কাজ হাতে তুলে নিয়েছে। সে জন্যই বোর্ডের বই এবার ছাপতে এত বিলম্ব। তবে প্রকাশকরা ছাপা বিলম্বের যে অজুহাতই প্রদর্শন করুক না কেন দায় থেকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ অব্যাহতি পেতে পারেন না। প্রকাশকরা কি করলো বা করলো না তা বোর্ড পর্যন্ত এসে থেমে যায়। বই ছাপা না হওয়ার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায়ী। তাকে জবাবদিহি করতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জনসাধারণের কাছে। কেননা এর দায়িত্ব নিয়ে কর্তৃপক্ষ বোর্ডে বসেছিলেন। প্রকাশক সমিতির পক্ষে পারা সম্ভব কিনা তা যাচাই করার দায়িত্ব ছিল তাদের। অন্যদিকে তাদের সামর্থ্য যাচাই না করে কেন তাদের ছাপার কাজ দেয়া হল তার জবাবদিহি বোর্ড কর্তৃপক্ষের করা উচিত। তার যথাযথ জবাবদিহি পাওয়া না গেলে সরকার থেকে বোর্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা ছাড়া বোর্ড কর্তৃপক্ষের মধ্যে দায়িত্ববোধ ফিরিয়ে আনা যাবে না বলে এখন মনে হচ্ছে।

তবে বই এর ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছাত্র-ছাত্রীদের সংকট এখন আগের তুলনায় অনেক বেশী। একসময় ছাত্র-ছাত্রীদের টেক্সট বুক পড়তে উৎসাহিত করা হত যাতে তাদের মৌলিক শিক্ষাটা পাকাপোক্ত হয়। অন্যদিকে বই প্রকাশকরা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে কোমলমতি ছাত্র-দের হাতে নোট বই, মেডইজি, গাইড বই তুলে দিত। এক পর্যায়ে সরকার এই ধরনের বই নিষিদ্ধও করেছিলেন। কিন্তু কেন জানি না পরে তা আর কার্যকর করা হয়নি। প্রকাশকরা টেক্সট বই-এর পাশা-পাশি নোট বই, গাইড বই ছেপেছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নোট বই, গাইড বই কিনতে বাধ্য করেছে। যারা নোটবই কিনতে চায়নি তাদের কাছে টেক্সট বই বিক্রি করেনি। এখন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বই বিক্রেতারা নোট ও গাইড বই-ই বেশী বিক্রি করে। প্রকাশকরা অসংখ্য নোট ও গাইড বই বের করেছে। এবং এটা যে স্কুল পর্যায়ে তা নয়, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নোট ও গাইড বই-এর ছড়াছড়ি। বেশীর-ভাগ ছাত্রছাত্রী এখন টেক্সট বই পড়ে না। এর বড় কারণ হল, টেক্সট বই পড়লেও তার সাহায্যকারী হিসাবে নোট বই দরকার। এ দু'টো বই কেনার মত সঙ্গতি বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর নেই। সেজন্য তারা একটি বই কিনে প্রয়োজন মিটাতে চায়। আমার এক পরিচিত লোক যে দিন আমাকে বলেছিলেন, তিনি প্রত্যেক বছর তাঁর বাড়ীর কাছের কলেজটির লাইব্রেরীর জন্য কিছু টেক্সট বুক কিনে দেন। এবার প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁকে নোট বই কিনে দেবার জন্য বলেছেন। এই প্রস্তাবে ভদ্রলোক প্রিন্সিপাল সাহেবের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি প্রিন্সিপাল সাহেবকে বলেছেন, একজন শিক্ষক হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নোট বই-এর উপর নির্ভরশীল হতে দেয়া সমীচীন হয়নি। বলাবাহুল্য, সমস্যাটি শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে হয় না। এটা শিক্ষকদের পর্যন্ত গড়িয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, শিক্ষক-অধ্যাপকরা অনেকেই নোট বই, গাইড ইত্যাদি অনুসরণ করেন এবং নিজেরা কষ্ট না করে ওসব বই পড়তে ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেন। নোট বই-এর আগ্রাসন যে কত তা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা পাতায় নোট ছাপার ঘটনায় উপলব্ধি করা যায়। সহায়ক গ্রন্থের প্রচলন সব দেশে কমবেশী আছে কিন্তু বাংলাদেশের নোট বই সহায়ক গ্রন্থ নয়, একেবারে প্রশ্নের উত্তর তৈরী করে দেয়া যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা কক্ষে গিয়ে তা হুবহু ঢেলে দিতে পারে। এ ধরনের গ্রন্থ নিঃসন্দেহে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের অন্তরায়। তবে এও ঠিক এখন ছাত্র-ছাত্রীরা যত সমস্যা ও টানাপোড়েনের মধ্যে পড়াশুনা করে তা অতীতে কখনো ছিল না। আগে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম ছিল একথা সত্য। তবে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও কম ছিল। কিন্তু এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যত বেড়েছে তার কয়েকগুণ বেড়েছে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। পূর্বে কয়েকগুণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পরও এখন হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পায় না। পক্ষান্তরে ক্লাসে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ায় শিক্ষকরা তাদের যথাযথ শিক্ষাদানে ব্যর্থ হন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার এই অপূর্ণতা ছাত্র-ছাত্রীরা পূরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে নোট বই, গাইড বই-এর ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে। বলাবাহুল্য, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষাদান করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মানও বাড়াতে হবে। এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণমান ভালো নয় বলে মানসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী কম পাওয়া যায়। একই কারণে ভালো শিক্ষকও পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে ভিসাস সার্কেলের মধ্যে পড়ে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক সবাই হাবুডুবু খাচ্ছে। কারো পক্ষে এর থেকে বের হয়ে এসে শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। যে শিক্ষক ছাত্র-জীবনে নোট-গাইড মুখস্ত করে পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়ে এসেছে সে শিক্ষক হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ওই একই মহাজনীপন্থার পরামর্শ দেবে এটা স্বাভাবিক। তাই কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া বাঞ্ছনীয়।